সারসংক্ষেপ (Abstract)

মহাকাব্য একটি জাতির সামগ্রিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে — এমন কথা বলেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরা আছে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এ। তাই সময়ের সাপেক্ষে ব্যক্তিক চেতনায় বারবার যেমন ধরা পড়েছে মহাকাব্যের ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা তেমনি আবার এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াও মহাকাব্য দুটি নতুন রূপে সজ্জিত হয়ে উঠেছে বারবার বিভিন্ন স্রষ্টার কলমে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৭), 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১১), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৯০৮) ও 'মহাভারতের কথা' (১৯০৯)' এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ' (১৯১০) ও 'ছোটদের মহাভারত' (১৯২৯) মহাকাব্যের সেরকমই এক বয়ান যাতে আসলে রামায়ণ আর মহাভারতের আখ্যানকে আমরা শিশুসজ্জায় সজ্জিত রূপে দেখতে পাই।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন জাগে মহাকাব্যের এই শিশুপাঠ্য রূপের গুরুত্ব কী? উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কী শিশুসাহিত্যের টানেই এটা করেছেন? হয়তো বা হতেও পারে কেননা তিনি মূলত শিশুসাহিত্যিক। কিন্তু আজ এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মহাকাব্যের এই শিশুপাঠ্য রূপগুলির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না।

উত্তর-আধুনিক বিভিন্ন তত্ত্বের প্রেক্ষিতে মহাকাব্যের জটিল অর্থগুলিকে বাদদিলে সামাজিক-পারিবারিক-নৈতিক দিক থেকে সাধারণ অর্থ উঠে আসে খুব সহজেই, তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় আবহমান কালের ভারতবর্ষকে। না হলে রামায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন বলেছিলেন যে এতে কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়! — ('রামায়ণ'/ "প্রাচীন সাহিত্য")। দ্বিতীয়ত মহাকাব্যের যে নানান অর্থ, যা আসলে গল্পের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে — সেই গল্পগুলি সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই যদি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যায় তবে পরবর্তীতে তার ভিন্ন মূল্যায়ণ বোধ হয় অনেক বেশি সম্ভব। মনে রাখতে হবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলা থেকেই রামায়ণ, মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আপামর বাঙালি সমাজে এই কাজটি দীর্ঘদিন যাবৎ চলে এসেছিল মা-ঠাকুমা অথবা ঠাকুরদার মুখে বলা গল্প থেকে। কিন্তু গত শতকের শেষ দিকে এসে একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দাপটে, অন্যদিকে বিজ্ঞাপনী চটক আর পণ্যসভ্যতার কবলে পরে মা-ঠাকুমাদের মুখ থেকে শোনা সেই রামায়ণী-মহাভারতী কথার স্রোত ক্ষীণ হতে হতে এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। ফলে প্রতিদিন চুরি হয়ে যাচ্ছে শিশুদের শৈশব, ছোট হয়ে যাচ্ছে তাদের কল্পনার জগৎ। অন্যদিকে নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড় ছিড়ে এক অনিকেত যাত্রায় ধাবিত এইসব শিশুদের অবস্থা পরবর্তীকালে কী দাঁড়ায় তা নিয়ে খবরের কাগজ বা দূরদর্শন চ্যানেলে প্রায়শই আলোচনা দেখা যায়।

অথচ আমাদের মহাকাব্যগুলির মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য্য-নীতি বিষয়ক সাধারণ শিক্ষার যে দিকটি সহজেই পাওয়া যায়— তা যদি শিশুদের সুকুমার মনে সঞ্চালিত করে দেওয়া যায় তাহলে শিশুর মানসিক গঠন নির্মাণ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর এই প্রেক্ষিতেই আমি আমার গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি এবং শেষে উপসংহারে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

অধ্যায়গুলি হল —

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় — শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায় — রামায়ণ আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাকর্ম

তৃতীয় অধ্যায় — মহাভারত আখ্যানের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য রচনাকর্ম

চতুর্থ অধ্যায় — শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষার প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের রচনাকর্ম

পঞ্চম অধ্যায় — মহাকাব্যের অন্যান্য শিশুপাঠ্য রূপদাতাদের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোরও যোগীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসের ভিত্তিতে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাবিদদের বিভিন্ন আলোচনার স্বাপেক্ষে এবং শিশুমনস্তত্ত্বের প্রেক্ষিতে শিশুশিক্ষা ও শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কেননা আমাদের মূল আলোচনার প্রবেশক স্বরূপ শিশুশিক্ষা এবং শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট অত্যন্ত জরুরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর ‘ছেলেদের রামায়ণ’, ‘ছোট্ট রামায়ণ’ রচনাকে এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ‘ছোটদের রামায়ণ’ রচনাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন শিশুদের জন্য, তাতে মূল রামায়ণী বৃত্তান্ত থেকে কোন অংশ তিনি সম্পূর্ণই বাদ দিয়েছেন, কোন অংশ আংশিক বাদ দিয়েছেন এবং কোন অংশ প্রসারিত করেছেন- এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর ‘ছেলেদের মহাভারত’, ‘মহাভারতের কথা’ রচনাকে এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর ‘ছোটদের মহাভারত’ রচনাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন শিশুদের জন্য তাতে মূল মহাভারতী বৃত্তান্ত থেকে কোন অংশ তিনি সম্পূর্ণই বাদ দিয়েছেন, কোন অংশ আংশিক বাদ দিয়েছেন এবং কোন অংশ প্রসারিত করেছেন- এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হ'ল মূল রামায়ণী ও মহাভারতী আখ্যান থেকে কিছু অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বা কিছু অংশ আংশিক বাদ দিয়ে বা কিছু অংশ প্রসারিত করে এই দুই শিল্পী শিশুদের জন্য যে রূপ দিলেন, তাতে রামায়ণ-মহাভারতের সাধারণ অর্থের কতটুকু ধরা পড়ল আর কতটাই বা তা শিশুসাহিত্য ও শিশুশিক্ষার উপযোগী হয়ে উঠল।

পঞ্চম অধ্যায়ে মূলত তুলনামূলকভাবে আমরা আলোচনা করে দেখেছি মহাকাব্যের শিশুপাঠ্য রূপ বা মহাকাব্যের বিশেষ কিছু অংশের শিশুপাঠ্য রূপ আরও যাঁরা দিয়েছেন যেমন — শশীভূষণ দাশগুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, অর্ধেন্দু শেখর ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্ব বিশ্বাস, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- এঁদের রচনাকর্মের স্বাপেক্ষে উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য কোথায়।

উপসংহারে সামগ্রিক ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা দেখলাম যে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শিশুসাহিত্য রচনায় আছে স্বপ্রতিভা, কোন আরোপিত প্রতিভা নয়। যাকে বলা যেতে পারে ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতার বলেই শিশুপাঠ্য মহাকাব্য রচনায় তারা দারুণ রকম ভাবে সফল হয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের শিশু উপযোগী ছোট ছোট শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আবার মাঝে মাঝে ঠাকুরদার ন্যায়ে গল্প বলার ঢঙ (যা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার অভাবকে অনেকটাই পূরণ করে)। মহাকাব্য পাঠকে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। যা না পড়লে ঠিক অনুভব করা যায়না। সাহিত্যের এক বড় গুণ মনের মধ্যে অনুরণন চালানো তা আমরা পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছি উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে।